স্বদেশের উন্নয়নে বিজ্ঞানঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাবনায়— পরিপ্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গ

ড. সুজয়া সরকার
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

পাশ্চাত্যের নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাবনাগুলি প্রসারিত হয়েছিল ভারতে-ঔপনিবেশিকতার সূত্র ধরে। এর একটি অন্যতম ফল হয়েছিল এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রচলন ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের উদ্ভব। বাংলা যেহেতু ছিল ব্রিটিশদের মূল কর্মক্ষেত্র, স্বাভাবিকভাবেই বাংলায় পাশ্চাত্ত্যের অভিঘাত এসে পড়েছিল একেবারে প্রথম পর্যায় থেকে। উনিশ শতক থেকে আরম্ভ করে তাই বাংলায় দেখা গিয়েছে বেশ কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে, যাঁরা তাঁদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শুধু ভারত নয়, বিশ্বেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এঁদের একজন হলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু,যাঁর কাজকর্মের পরিধি বিশ শতকের একটি বড় সময় জুড়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে একজন বিশ্বমানের বৈজ্ঞানিক হিসেবে – বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব বা বোসন-এর উদ্ভাবক হিসেবে যাঁর নামটি উচ্চারিত হয়। স্বয়ং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বের প্রশংসাকারী। কিন্তু শুধু বিজ্ঞানের গবেষণায় উচ্চমানের তত্ত্বের আবিষ্কার নয়, বরং এর প্রায়োগিক দিকটিকে স্বদেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমানভাবে তৎ পর। এক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বহু ধরণের উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যায়, যার মধ্যে তাঁর স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশের মানুষের উন্নয়ণের ভাবনাটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এইরকম একটি উদ্যোগ হল বাংলায় বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ও সেক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

...

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম। তাঁর বাবা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন রেলওয়ের হিসাবরক্ষক, মায়ের নাম আমোদিনী দেবী। তাঁর পরিবার ছিল সেই সময়কার কলকাতায় সম্ভ্রান্ত, উদারপন্থী ও আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন।[১] সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষাগ্রহণ প্রথমে নর্ম্যাল স্কুল, তারপর নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল এবং তারপর হিন্দু স্কুলে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে তাঁর নিজস্বতা, স্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিমত্তা ধরা পড়েছিল শিক্ষকদের চোখে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে আই.এস.সি., ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বি.এস.সি. (গণিতে অনার্স) এবং ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে এম.এস.সি. (মিশ্রগণিতে) — এই তিনটি পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।[২]

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ বসু পদার্থবিদ্যা ও মিশ্রগণিতের লেকচারার হিসেবে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে নতুন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসেবে তিনি যোগদান করেন। সেখানে পঁচিশ বছর অধ্যাপনার পর ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমেরিটাস অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের শেষ পর্বে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। আবার ভারত সরকারের দ্বারা পদার্থবিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত 'বোস সংখ্যায়ন' সহ বহু গবেষণা এবং বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্মেলনে তাঁর সুগভীর বক্তব্যগুলির মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতিচ্ছবি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডের গতিময়তার সাথে সাথে মানবহৃদয়ে হয়ে থাকবেন চির ভাস্বর।

...

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরণের কর্মের মাধ্যমে, যেগুলি তাঁকে প্রকারান্তরে দেশের প্রতি অনুরাগী এক ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিল এবং তাঁর বিজ্ঞানসাধনাকেও সেই দিকে চালিত করেছিল। ব্রিটিশবিরোধিতা ও জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে তাঁর কাজ ও মানসিকতাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বটি স্বদেশি বিপ্লবকালীন। এই সময় ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবোধের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল অনুশীলন সমিতিতে যোগাযোগের মাধ্যমে। সহপাঠী বন্ধু জীবনতারা হালদারের প্রেরণায় তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য হয়েছিলেন।[৩] তবে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্দিষ্ট কোন ব্রিটিশ বিরোধী উদ্যোগের সাথে সামিল হতে পারেননি, বরং ছিলেন কিছুটা আবেগবিহ্বল। পিতা সুরেন্দ্রনাথের আপত্তির কারণে তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করেননি। কিন্তু কলেজ জীবনে তাঁর ব্রিটিশ বিরোধিতার পরিচয় দেখা গিয়েছিল — কলেজে একজন ইংরেজ অধ্যাপক (মি. হ্যারিসন) দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্রকে অকারণে লাঞ্ছনা ও অপমান করেন। সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ছাত্ররা এই লাঞ্ছনার যে প্রবল প্রতিবাদ করেন, তাতে সেই অধ্যাপক নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছিলেন।[৪]

দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে অভিহিত করা যায় ১৯১৬–১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে।[৫] যার বেশিরভাগ সময়টা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ঢাকায়, তবে তাঁর যোগাযোগ ছিল কলকাতা, প্যারিস ও বার্লিনের সাথে। এই সময় তিনি সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন বিপ্লববাদকে, – ব্রিটিশবিরোধিতার জন্য। এমনকি এই কারণে তাঁকে পুলিশের নজরেও পড়তে হয়েছিল। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দুজন বিপ্লবীকে তিনি সাহায্য করেছিলেন আন্তরিকভাবে। এঁদের একজন হলেন অবনীনাথ মুখার্জি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অবনীনাথ জার্মানদের সাহায্য নিয়ে আমেরিকান অস্ত্র ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিপ্লবী কাজের কারণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে জার্মানি ও ফ্রান্সে ছিলেন।[৬] সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছিলেন। গুপ্তসমিতির পক্ষ থেকে দেওয়া টাকা সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশ সফরকালে এই বিপ্লবীকে পৌঁছে দিয়েছিলেন।[৭] এমনকি প্রয়োজনে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। দ্বিতীয় জন হলেন শৈলেন ঘোষ। তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তরে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। তিনি বিপ্লবী কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়া থেকে রেহাই পেতে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, যেক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। আবার পরে যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে চাকরিতে যোগদানের ক্ষেত্রেও সত্যেন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[৮]

জাতীয়তাবাদের তৃতীয় অধ্যায় যা তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা হল ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগ–যা তিনি কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি।

সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সম্পর্কিত লেখার মধ্যেও মাঝে মাঝেই প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে পরাধীন ভারতের যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির কথা। পরাধীনতা যে ভারতীয়দের বিজ্ঞানের গবেষণার পথে অন্তরায় ছিল, তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। 'দেশ-বিদেশে বেতার চর্চা-আদিপর্ব' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'দেশে তখন স্বাদেশিকতার বিপুল বন্যা ডেকেছে। ....জগদীশ বোস ইচ্ছা করলেই মার্কনীর মত দেশে বিদেশে বেতারে বার্তা পাঠাতে পারতেন, বিদেশী সরকার তাঁকে যদি একটু বেশী সুযোগ-সুবিধা দিত।'[৯] তিনি লিখেছেন যে প্রফুল্লচন্দ্র রায় যখন বিদেশে অধ্যয়ন করে দেশে ফিরেছিলেন বিদেশী সরকার তাঁর উপযুক্ত শিক্ষাপদে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে সম্মানিত করে নি।[১০] আবার জল সমস্যা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি যখন হিজলি জেলের উল্লেখ করেছেন, বলেছেন যে জনবসতিহীন হিজলিতে ব্রিটিশ সরকার জেল তৈরি করতে চেয়েছিল, যার অন্যতম কারণ ছিল 'স্বদেশী ছেলেরা যেন গ্রামের লোকের সংস্পর্শে না আসতে পায় – দেশপ্রেমের বিষ যেন চারিদিকে না ছড়ায়'।[১১] এই ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতার সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে দেশে জাতীয়তাবাদী শিল্প প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী তাও তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে,[১২] যার মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন স্বাদেশিকতা ও বিজ্ঞানচর্চার সুনিবিড় যোগসূত্রের কথা।

তাঁর লেখা গবেষণাপত্রের বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি প্রথমে ইংরেজিতে লেখা তাঁর গবেষণাপত্রটি ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন 'ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যেকোন কারণেই হোক নীরব ছিলেন।[১৩] ইতিমধ্যে কৌতূহলবশতঃ তাঁর এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধের একটি অনুলিপি তিনি পাঠিয়ে দেন জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কাছে। আইনস্টাইন অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দিলেন এবং জানালেন যে সত্যেন্দ্রনাথের কথাগুলি এতই মূল্যবান যে তিনি নিজেই তর্জমা করে জার্মানীতে ছাপিয়ে দেবেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন, 'ইংল্যান্ড থেকে কোন খবর আসার অনেক আগেই এ প্রবন্ধ প্রকাশ হলো।'[১৪] তিনি পৃথিবীখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলেন ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীতে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ্যার জার্নালে প্রকাশিত তাঁর গবেষণাপত্রের মাধ্যমে।

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ যখন বার্লিনে গিয়েছিলেন, আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় ভারতে ব্রিটিশ পরাধীনতার কথাটি উঠে এসেছিল। আইনস্টাইন যখন সত্যেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাক— এটা সত্যই ভারতীয়রা চায় কিনা। সত্যেন্দ্রনাথের অকপট উত্তর ছিল, 'নিশ্চয়ই আমরা সকলেই নিজেদের ভাগ্যবিধান নিজেরাই করতে চাই।' যথার্থ স্বদেশপ্রেমের প্রতিফলন, যেখানে স্বাধীনতাকামী যুবক বৈজ্ঞানিকের আত্মদর্শন উন্মোচিত। আইনস্টাইনের পরের প্রশ্ন, 'ধরো তোমার হাতের কাছে একটা বোতাম রয়েছে, যেটি টিপলে সব ইংরাজ তোমার দেশ থেকে চলে যাবে তা হলে সত্যই কি তুমি সেই বোতাম টিপে দেবে ?' সত্যেন্দ্রনাথের সহাস্য উত্তর, 'ভগবান যদি এমন একটা সুযোগ আমাকে দেন, তো ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে সেটি আমি টিপে দেব'।[১৫]

১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইসরায়েলে ইংরেজ প্রভুত্বের বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন, 'ইংরাজ প্রভু আমাদের দেশের মত তাঁর প্রভুত্ব ভেদনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। ভারতবর্ষের সকলে এই কূটনীতির সঙ্গে সুপরিচিত ও এর বিষময় ফলে এখনো আমরা জর্জরিত রয়েছি।'[১৬] এই বক্তব্যেও উঠে এসেছে তাঁর নির্ভীক স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি।

এই জাতীয়তাবাদী ও স্বাদেশিকতার ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের কাজকর্মের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাবনায়, যার একটি হল স্বদেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিক চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগ গ্রহণ। দেশাত্মবোধ সত্যেন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে। ছাত্রজীবনেই তিনি কয়েকজন বন্ধুর সাথে শ্রমিকদের জন্য নৈশবিদ্যালয়ে (কেশব একাডেমি) শিক্ষকতা করেছিলেন। এই শ্রমিকরা ছিলেন বাজারের ফড়ে, পালকি বেহারা, সাধারণ দোকানদার— এই ধরণের শ্রমজীবি মানুষ। সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন, নিরক্ষর মানুষগুলির আমাদের কাছ থেকে দেশ-বিদেশের নানা কথা শোনা, ধীরে ধীরে অক্ষর জ্ঞান অর্জন করার ভিতর দিয়ে তাদের জানার কৌতূহল বৃদ্ধি পেত।[১৭] পরবর্তীকালে তিনি উপলব্ধি করেন যে দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া ভীষণভাবে জরুরি। এক্ষেত্রে তাঁর অনুপ্রেরণা ছিলেন অগ্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাজ ও চিন্তাচেতনা। ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার জনগণের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষাকে কিভাবে জনপ্রিয় করে তোলা যায়, বিজ্ঞানের সুফলগুলি সম্পর্কে তাদের কিভাবে অবহিত করা যায় এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানকে কিভাবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের চিন্তাভাবনার সাথে একাত্ম করে তোলা যায়— এইসব ভাবনা এই বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিকের চেতনায় সবসময় যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল।

...

সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের অধিকাংশ সময় ধরে যে বিষয়টিকে নিয়ে তিনি ভীষণভাবে ভাবিত ছিলেন, তা হল বাঙালিদের কাছে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ধারণাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলা। বেশ কিছু আগে থেকেই এক্ষেত্রে নানা ধরনের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। বাংলার মানুষের কাছে সহজভাবে বিজ্ঞানচর্চাকে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর ভাবনা ও অবদান যথেষ্ট। এক্ষেত্রে তাঁকে সম্ভবতঃ সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন এই তরুণ বিজ্ঞানীকে। 'বিশ্বপরিচয়' লোকশিক্ষামূলক গ্রন্থ হিসেবে পরিকল্পিত হলেও শেষ পর্যন্ত এটি হয়ে উঠেছিল কবিগুরুর পরিণত বয়সের বিজ্ঞান-দর্শনের এক সচেতন রূপ। ১৯৩৭ সালে লেখা এই গ্রন্থের উৎসর্গনামায় কবি লিখেছেন—

'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

প্রীতিভাজনেষু,

এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলাবাহুল্য, এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। ...যাইহোক আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশক কর্তব্যকর্মে নামেন তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানচর্চাকে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা—'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি।' বিশ্বজগতের এই সাধনা থেকে বঞ্চিত মানুষদের তিনি 'আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে একঘরে' হয়ে থাকা মানুষ হিসেবে খেদোক্তি করেছেন। অবৈজ্ঞানিক মনের দৈন্য 'কেবল বিদ্যার বিভাগ নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে' বলেও তিনি হতাশা প্রকাশ করেছেন।[১৮] গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণে কবিগুরু 'বিশ্বপরিচয়' রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল।' তাই যে বয়সে শরীরের অপটুতা ও মনোযোগশক্তির স্বাভাবিক শৈথিল্যবশত সাধারণ সুপরিচিত বিষয়ের আলোচনাতেও স্খলন ঘটে সেই বয়সেই তিনি অল্প পরিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন।[১৯] রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা সত্যেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্যোগকে 'লোকপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার একটি আদর্শ স্থাপন'[২০] হিসেবে অভিহিত করেছেন।

...

সত্যেন্দ্রনাথ বসু দেশের উন্নয়নে ও অগ্রগতিতে বিজ্ঞানচর্চার নিরন্তর প্রবাহের বার্তাকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রধান দিক নিঃসন্দেহে তাঁর অধ্যাপনাকর্মের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণা, যা তাঁকে বিশ্ববন্দিত করেছে। কিন্তু প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তাঁর বহুমাত্রিক ক্রিয়াকলাপ— প্রথমতঃ তাঁর নিজের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং তৃতীয়তঃ নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান-পত্রিকার প্রকাশ। তিনি তাঁর জীবনের অন্তিমপর্ব পর্যন্ত এই সবের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলির মধ্যে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে লেখা, কতকগুলি আবার দেশী ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা ও অবদানের বিষয়ে সমৃদ্ধ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে এই সব প্রবন্ধগুলি তিনি রচনা করেছিলেন বাংলাভাষায়। তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ 'বিজ্ঞানের সংকট', প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে।[২১] সুন্দর উপস্থাপনার গুণে জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনাও যে সাধারণ মানুষের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে–এই লেখাটি তার একটি অন্যতম নিদর্শন। তাঁর রচিত অন্যান্য বিজ্ঞান-নির্ভর প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনার উল্লেখ করা যায়।

'শক্তির সন্ধানে মানুষ' তাঁর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা, যেখানে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় জগতের সৃষ্টির মূলসূত্র, বস্তু জগতের ব্যবহারিক সূত্র এবং সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা। উঠে এসেছে ইউরেনিয়াম বিস্ফোরণের কথা, যা সেইসময় লোকক্ষয়কারী হিসেবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার আশার কথাও তিনি শুনিয়েছেন তাঁর লেখায়। আক্ষেপ করেছেন যে খনিজ সম্পদের সম্পূর্ণ খবর ভারতীয়দের জানা নেই। আশা করেছেন যে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে, যাকে তিনি 'নতুন যুগ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার প্রভূত প্রসার হবে এবং তার জন্য নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত চেষ্টার প্রয়োজন। তাঁর সর্বশেষ সোচ্চার উপলব্ধি হল 'যে কোন জাতির পক্ষে আজ বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা কিংবা তার সম্ভাব্যতাকে অবহেলা করা একান্ত বিপজ্জনক। সাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি একথা স্বীকার করবেন।'[২২] 'দেশ-বিদেশে বেতার চর্চা (আদি পর্ব)', 'জলসন্ধানী যাদুকর' বা 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানে অগ্রগতি' সব লেখাগুলিই যেন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত ও উদ্দীপক। পাশাপাশি তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখা দেশ-

বিদেশের উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিকদের অবদানের কথা। সত্যেন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে বারবার ধ্বনিত হয়েছে এই কথাটি যে এই সময়কাল প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার যুগ, বিজ্ঞানের আত্মপরীক্ষার যুগ।[২৩]

...

দেশের মানুষকে বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি একটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণে স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন— তা হল মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার পরিসরটিকে বিস্তৃত করা, যা একই সাথে হয়ে উঠবে গভীর ও হৃদয়গ্রাহী। পাঠদানকালে বা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তিনি জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপরও বক্তৃতা করেছেন বাংলা ভাষায়। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি হল, 'যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।'[২৪] তিনি লিখেছেন, 'ইংরেজি ভাষা বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি জোগালেও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীর মনোভাব তৈরি করেনা। তার জন্য চাই বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি ও নির্ভীকভাবে সত্যানুসরণের প্রেরণা।'[২৫] অতীতের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, ইংরেজি প্রবর্তনের আগে এ দেশেও স্বাধীনচেতা সংস্কারমুক্ত অনেক সত্যসন্ধানী জন্মেছিলেন, যাঁদের এখনকার মানদণ্ডেও বিজ্ঞানী বলা চলে। ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। তাঁরা তাঁদের সাধনার ফল, সুচিন্তিত অভিজ্ঞতার ফল এদেশের ভাষাতেই লিখে গেছেন। 'পরাধীনের মনোভাব, বৃথা শিক্ষার গর্ব ও বিদেশী ভাষার মোহ তখন এ দেশীয়দের সত্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি।'[২৬]

সত্যেন্দ্রনাথের অভিমত ছিল যে বাংলায় পাঠ্যবই রচনার ক্ষেত্রে প্রায়োগিক বিদ্যার উপযোগী পাঠ্যবই সবার প্রথমে রচনা হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়গুলির মধ্যে তিনি চিকিৎসা ও যন্ত্রনির্ভর বিভিন্ন প্রায়োগিকবিদ্যা এবং আইনের বইকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৭]

তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন যে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের অন্ততঃ একটির পরিচালনার দায়িত্ব রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অর্পণ করার জন্য। এ ব্যাপারে যদি কোন আইনগত বাধা থাকে, তা অপসারণের ব্যবস্থাও আশু করা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত দেন। তিনি চেয়েছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব থাকবে নির্দিষ্ট মেডিক্যাল কলেজটিতে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাভাষা প্রচলনের বিষয়ে।[২৮]

বিজ্ঞানের পরিভাষা বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল। তিনি লিখেছেন, 'আমি সবসময়ে মনে করি যে, আমাদের দেশের বিজ্ঞানী লেখকদের শুধু বিজ্ঞান জানালেই চলবে না, তাদের চেষ্টা চাই যারা বিজ্ঞান বোঝে না তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। এবং সেইমত একটা ভাষা সৃষ্টি করা তাদের দায়িত্ব।'[২৯] আবার পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শ্লথগতির কারণে তিনি বিকল্প চিন্তাধারার কথাও তুলে ধরেছেন— সেখানে তিনি বলেছেন যে প্রচলিত বিদেশী কথাগুলিকে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে এইভাবে হয়ত বিজ্ঞানের প্রচার কাজে অনেক তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া সম্ভব হবে। বাংলাভাষা যেহেতু সতেজ ও প্রাণবন্ত, তাই অন্য ভাষা থেকে নতুন কথা আহরণ করতে ইতস্তত করে না। এইভাবে তিনি সব ধরণের চেষ্টার কথাই তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'পরিভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ... আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অনেকাংশ পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে নেওয়া। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে যে নামে চিহ্নিত করছে, সেই তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে আমরা সেই নামসমেত গ্রহণ করেছি। সেই নামের প্রতিশব্দ সন্ধান করা অনেকটা টেলিফোনকে দূরভাষ যন্ত্র বলার মতই বাতুলতা। অপরের কাছ থেকে নেওয়া জিনিস অপরের নামেই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।'[৩০] বাংলাভাষায় বিভিন্ন বিদ্যার ও বৃত্তির নিয়মিত চর্চার ফলে বাংলা পরিভাষা যথাকালে দেখা দেবে বলে তিনি সুনির্দিষ্ট আশা ব্যক্ত করেন। ততদিন পর্যন্ত ইংরেজি পরিভাষাকে অন্ত্যজ জ্ঞান করার কোন কারণ নেই। তিনি এটাও বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ইংরেজি পরিভাষা যদি বাংলায় সাজ বদল করে, তাতে বাংলারই লাভ। কোন ভাষাই চারিদিকে দেওয়াল তুলে সমৃদ্ধ হতে পারে না।[৩১]

...

ব্রিটিশ আমলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। মূল লক্ষ্য অবশ্যই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে বিজ্ঞানের স্বরূপ ও অবদানকে পৌঁছে দেওয়া। এজন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-

পত্রিকা ও গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সুসংবদ্ধভাবে কোন একক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই ধরণের ভাবনার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে কোন সদর্থক মানসিকতা আশা করাও ছিল বৃথা।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু সহ বেশ কিছু বিদ্বান ব্যক্তি। এর অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিস্তৃত সামাজিকীকরণ। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে। এই স্বাধীনতার যা কিছু সুফল, তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের আয়ত্তের মধ্যে না থাকে, সেগুলি যেন দেশের লোকের সকলের কাছে পৌঁছে যায়।'(৩২) এইভাবে সর্বস্তরে বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তারকে লক্ষ্য রেখে কলকাতা শহরে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হল 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার বিস্তারে এই ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ভারতে প্রথম। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ বছর তিনি সানন্দে এই দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গঠনতন্ত্রে (২৮.২.১৯৪৯ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত) এর উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে – বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান সচেতন করা এবং সমাজের কল্যান কল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা।

এর উপায় হিসেবে বলা হয় —

প্রথমতঃ- বিজ্ঞানের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূলসূত্র ও পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিকদের জীবনী ও কর্মকাণ্ড এবং মানুষের জীবন ও সভ্যতার ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক আলোচনা ও প্রচার করা।

দ্বিতীয়তঃ- এক বা একাধিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করা এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন, প্রকাশ ও ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়তঃ- বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন ও প্রচার করা।

চতুর্থতঃ- পাঠাগার, সংগ্রহশালা ও পরীক্ষাগার স্থাপন ও পরিচালনা করা, বিজ্ঞান আলোচনার ব্যবস্থা করা, বিজ্ঞান সম্মেলন ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা ইত্যাদি।(৩৩) অর্থাৎ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে, বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গ্রন্থ ও ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ধারাবাহিক ভাবে। লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালার মধ্যে প্রথম দিকে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের লেখা 'তড়িতের অভ্যুত্থান' (১৯৪৯), নীলরতন ধরের 'আমাদের খাদ্য' (১৯৪৯), গিরিজা প্রসন্ন মজুমদারের 'উদ্ভিদ জীবন' (১৯৫৫), হীরেন্দ্রনাথ বসুর 'কাচ ও কাচ শিল্প' (১৯৫৭) ইত্যাদি। বিজ্ঞান প্রবেশ গ্রন্থমালার মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যর লেখা পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান পরিষদ থেকে প্রকাশিত বিশেষ গ্রন্থগুলির মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, বিজ্ঞান শিক্ষক সম্মেলন এমনকি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা' নামে একটি বার্ষিক বিশেষ বক্তৃতার সূচনা হয়। ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে দুটি সুপরিকল্পিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

তবে বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হল 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকায় অবস্থানকালে 'বিজ্ঞান-পরিচয়' নামে একটি দ্বি-মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহ বিদগ্ধ ব্যক্তিরা স্বাগত জানিয়েছিলেন এই উদ্যোগকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় লিখেছিলেন, 'আমি মনে করি দেশকে বিজ্ঞান-শিক্ষায় অভিষিক্ত করে দেওয়া তার সফলতা সাধনের উদ্দেশে একটি মহৎ কর্তব্য।'(৩৪) ১৯৪০ -এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে খয়রা অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার জন্য ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসেন। এর কিছুদিন পরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ছত্রছায়ায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশ তাই নিঃসন্দেহে এক সুচিন্তিত উদ্যোগ। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার ১৪ জন লেখকের মধ্যে ছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিনয় কুমার সরকার, গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তি। প্রথমদিকের সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে কয়েকটি লেখার শিরোনাম উল্লেখ করা যেতে পারে — 'বিজ্ঞানের পরিচ্ছেদ' (১৯৪৮), 'হিমালয়ের ইতিকথা' (১৯৪৯), 'বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি' (১৯৫০), 'লোকগণনার কথা' (১৯৫০), 'ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান' (১৯৫৯), 'ঋগ্বেদে বিজ্ঞান' (১৯৬৫), 'বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব' (১৯৬৭) প্রভৃতি। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় বিশেষ সংখ্যা— ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আচার্য জগদীশ বসু সংখ্যা, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে রাজশেখর বসু সংখ্যা, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা ও প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাদিবস সংখ্যা প্রভৃতি। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন, 'আমার এক বন্ধু বলেছেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সেদিনই সার্থক হবে, যেদিন তোমরা বাংলা ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পারবে। এই চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এর একটি বিশেষ সংখ্যায় মৌলিক গবেষণার বিষয়ে নিবন্ধাদি প্রকাশ করতে পারি। এজন্য গবেষক-কর্মী ও গবেষক-ছাত্রদের কাছে নিবন্ধাদির জন্য আবেদন জানাচ্ছি।'[৩৫] এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৬০ সালে 'রাজশেখর বসু সংখ্যা' প্রকাশিত হয় বিশেষ সংখ্যা হিসেবে।

•••

সত্যেন্দ্রনাথ আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন বাংলায় বিজ্ঞানের সামাজিকীকরণে। বিজ্ঞান যে শুধুমাত্র এক বিমূর্ত ধারণা নয়, শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বিদ্বান ব্যক্তিদের আলোচনা ও কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাকে সর্বস্তরের জনমানসে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য তাঁর বহুমুখী উদ্যোগ বাংলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রটিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখেছেন, 'বহুদিন থেকে আমি বলে এসেছি— বিদেশি শিল্প ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যদি দেশের মধ্যে তাড়াতাড়ি চালু করতে হয়, তবে এদেশের পণ্ডিতকে কষ্ট করে সহজ ও সরলভাবে লোকে যে ভাষা সহজে বুঝবে, সেই ভাষাই বই-এ লিখতে হবে।'[৩৬] এর এক দশক পরে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবার বলেছেন, যে দেশের দ্রুত উন্নতি ও সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রতি ঘরে বিজ্ঞানের কথা পৌঁছে দিতে হবে। এই কাজে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি দেশের শিক্ষিত তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন।[৩৭]

সত্যেন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন বাংলার বিশাল জনসংখ্যার কথা— যারা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাগ্রহণে পশ্চাৎ পদ হয়ে রয়েছে। তাই তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন দেশের উন্নয়নে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা। তিনি বলেছেন, 'আমাদের মনের ভাষা বাংলা ভাষাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হলে তার উপর কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। সেই ভাষায় কাজের চিন্তা করতে হবে। তবেই এ ভাষা কাজের ভাষা হয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এইভাবে আমাদের বিদ্বান, পণ্ডিত, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, কারিগর, কারবারী, সরকারি আমলা যখন এই বাংলাভাষাকে তাঁদের মুখের, মনের ও কাজের ভাষা করে দাঁড় করাতে পারবেন, তখনই বাংলাদেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের নাড়ীর যোগ ফিরে পাবেন, বাংলাভাষাকে ভালবেসে কাজকেও ভালবাসতেন। সাধারণ মানুষও উপর তলাকার জ্ঞানভাবের শরিক হয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।'[৩৮] এইভাবেই বিজ্ঞানকে তিনি করে তুলতে চেয়েছিলেন নতুন বাংলার উন্নয়নের হৃদ্‌স্পন্দন। এক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সচেতন প্রয়াসের উপর ভীষণভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন এই বিজ্ঞানী। তিনি নিজে ট্রেনে করে যাওয়ার সময় আশেপাশের সাধারণ মানুষদের সাথে মিশে যেতেন— পেশায় তাঁরা হয়ত চর্মকার বা কর্মকার। এই নানান ধরণের মানুষের সাথে আলাপ-চারিতায় বুঝে নিতে চাইতেন তাঁদের কাজকর্মের প্রয়োগ পদ্ধতি বা সমস্যা। তাঁদের মনে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন।[৩৯] মেদিনীপুরের (ঝাড়গ্রাম) এক সংস্থার সম্পাদককে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের পল্লীসমাজ আবার সঞ্জীবিত করে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।... তারই ওপর বুনিয়াদ করে নতুন ইমারত উঠবে।'[৪০]

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই উদ্যোগ— যার মূল ভাবনা ছিল বিজ্ঞানকে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কাছে অর্থবহ করে

তোলা— সবসময় সমালোচনামুক্ত ছিল না। তিনি বলেছেন, 'পরিষদের কাজে বহু বাধা আছে ঠিকই কিন্তু আমরা মনে করি, এ কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আরো অনেকে আমাদের সঙ্গে একই মত পোষণ করেন। আমাদের হতোদ্যম হলে চলবে না, যথাসাধ্য কাজ করে যেতে হবে।'[৪১] কাজ তিনি করে গিয়েছেন আজীবন— দেশবাসীর মধ্যেকার সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে— স্বদেশকে উন্নয়নের অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে।

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এই বাঙালি বিজ্ঞানী লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (FRS) হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর যে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে লেখা হয়েছিল তাঁর এই জীবনব্যাপী সাধনার কথা, '...বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে সঙ্গে দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তোমার প্রগাঢ় অনুরাগ, মাতৃভাষার প্রতি তোমার সুগভীর মমত্ববোধ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। জাতির কল্যাণে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন ও তথ্যাদি পরিবেশনের উদ্দেশ্যে তুমি 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপন করিয়াছ এবং প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি রূপে ইহাকে পরিচালনা করিতেছ। জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তোমার এই কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।'[৪২]

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞান সাধনার ধারা আজও অপ্রতিহত গতিতে ধাবমান বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। স্বাধীন বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে অভিমুখ তৈরি করেছিলেন বাংলাভাষাকে মর্যাদাদানের মধ্য দিয়ে, সমস্ত বাঙালিকে একসূত্রে কাজের নিরীখে এগিয়ে চলার পথ নির্দেশ করে— তা নিঃসন্দেহে এক নতুন বাংলার জন্ম সম্ভব করেছে। আজ বাংলায় দেখা যায় বিভিন্ন বিজ্ঞান-পত্রিকার প্রকাশ, বিজ্ঞান-ক্লাবের পত্তন বা বিজ্ঞান আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতার মানসিকতা তৈরির পরিমন্ডল। এ সমস্ত কিছুর মধ্যে যেন এই স্বদেশপ্রেমী বিজ্ঞানীর স্পর্শ অনুভব করা যায়— যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বদেশের উন্নয়নে ও স্বদেশবাসীর সেবায় বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করার। তাঁর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী যেন নতুন করে মনে করিয়ে দেয় তাঁর এই আন্তরিক উদ্যোগ ও অক্লান্ত আন্দোলনের কথা— বর্তমান প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে এই ধারাবাহিকতা রক্ষায়।

তথ্যসূত্র

১. *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন*, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৪০৫, পৃষ্ঠা ৪; আশীষ লাহিড়ী, 'ব্রহ্মাণ্ডের ছকে তাঁর নাম আঁকা', রবিবারোয়ারি, *এই সময়* পত্রিকা, ১৪ জানুয়ারি, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১।

২. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, *প্রসঙ্গ সত্যেন্দ্রনাথ বসু*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ডিসেম্বর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২১; অজয় চক্রবর্তী, 'বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ, মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ', ধনঞ্জয় ঘোষাল (সম্পা.) *বলাকা— বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব*, বর্ষ-১৮, সংখ্যা ২৮, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা ৮৪।

৩. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬।

৪. *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫।

৫. Partha Ghose, 'S. N. Bose : The Man', in Kameshwar C. Wali (Ed.), *Satyendra Nath Bose— His Life and Times*, World Scientific Publishing Co. Pvt. Ltd, Singapore, 2009, pp.402-403.

৬. Partha Ghosh, Ibid; সত্যেন্দ্রনাথ বসু, *আমার কথা* (অনুলিখন : পূর্ণিমা সিংহ), বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩।

৭. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬-২৭।

৮. Partha Ghosh, Ibid, p.403.

৯. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'দেশ-বিদেশে বেতার চর্চা–আদিপর্ব', মাসিক বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন*, পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৭০।

১০. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র', *আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ*, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৬১, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন*, পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৫৩।

১১. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'জল সন্ধানী যাদুকর', দ্বীপপুঞ্জ, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৭১।

১২. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানে অগ্রগতি', পাণ্ডুলিপি, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৭৮।

১৩. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২; বিমলকুমার মজুমদার, 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু থেকে বিশ্ববরেণ্য 'বোস' হয়ে ওঠার উপাখ্যান', *বর্তমান পত্রিকা,* ১.২.২০১৮।

১৪. *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৪।

১৬. পূর্বোক্ত।

১৭. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* পঞ্চদশ খণ্ড, আগস্ট ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ২০৩।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৬।

২০. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমেলা প্রকাশের সময় নিবেদন, ২০ মাঘ, ১৩৫৫, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৩৫।

২১. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'বিজ্ঞানের সংকট', পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৮, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৯-২৬।

২২. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'শক্তির সন্ধানে মানুষ', জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, ১৯৪৮, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৩।

২৩. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'বিজ্ঞানের সংকট', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬।

২৪. *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮।

২৫. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার', জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, ১৯৬২, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৫৬।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭।

২৭. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে', পাণ্ডুলিপি, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৩৮।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০।

২৯. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'পরিভাষা প্রসঙ্গে', গবেষণা, খণ্ড-২, সংখ্যা-১, ১৯৭০, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৩৬।

৩০. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮-১৩৯।

৩২. জয়ন্ত বসু, *বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ— পঞ্চাশ বছর পরিক্রমা,* বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২০০০, পৃষ্ঠা-vi।

৩৩. পরিষদের প্রথম গঠনতন্ত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩৯-৩৪০।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮; *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮।

৩৫. জয়ন্ত বসু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩।

৩৬. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মুখবন্ধ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, *বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে), ১৯৮১, পৃষ্ঠা বার।

৩৭. জয়ন্ত বসু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৭।

৩৮. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রবর্তনের সমর্থনে আবেদন', প্রবর্তন সমিতি আয়োজিত বাংলা প্রবর্তন সপ্তাহ পালনের জন্য আবেদন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ এ প্রদত্ত বক্তৃতা, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন,* পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩।

৩৯. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০; ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯।

৪০. মেদিনীপুরের (ঝাড়গ্রাম) কোন একটি সংস্থার সম্পাদককে লিখিত চিঠির প্রতিলিপি, তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, পূর্বোক্ততে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৯৭।

৪১. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দশম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে (১৯৫৮) সভাপতি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষণ, জয়ন্ত বসু, পূর্বোক্ততে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৬৭।

৪২. জয়ন্ত বসু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯।